গণিতভীতি বনাম গণিতপ্রীতি

লাবনী আক্তার শিমলা

সমস্যা, অনুসন্ধান, যুক্তি এবং সমাধান– এই চারের সমন্বিত রূপ গণিত। গণিতকে বলা হয় বিজ্ঞানের রাজা। বলা হয়, এই মহাবিশ্বের ভাষা হলো গণিত। গণিতের মাধ্যমেই একের পর এক রহস্য উদ্ঘাটন ও সমাধান করেছেন বিজ্ঞানীরা, যার ধারায় বিশ্ব আজ আধুনিকতার ছোঁয়া পেয়েছে। অথচ এশিয়া, বিশেষ করে দক্ষিণ এশিয়ায় গণিতের প্রতি ভীতি প্রবল। যেখানে গণিত খোলে মহাবিশ্বের কঠিন রহস্যের জট, সেই জট খোলার প্রাথমিক হাতেখড়িতেই আতঙ্কগ্রস্ত বাংলাদেশসহ এশিয়ার বহু দেশের শিক্ষার্থীরা। সম্প্রতি এক পরিসংখ্যানে দেখা গিয়েছে, প্রাথমিক থেকে উচ্চমাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত প্রায় ৭০ শতাংশ শিক্ষার্থী গণিতকে ভয়ের বিষয় হিসেবে চিহ্নিত করে। শুধু শিক্ষার্থীরা নয়, তাদের অভিভাবকরাও গণিতে প্রাপ্ত নম্বরের প্রতি অধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। এছাড়া সমাজেও প্রচলিত রয়েছে গণিত সবাই পারে না, এটি অনেক কঠিন বিষয়। এই ভয় ও মানসিকতা থেকেই বন্ধ হয়ে যায় গণিত জয়ের স্বপ্ন। ফলে অনেকেই তাদের ভবিষ্যৎ ক্যারিয়ারে পিছিয়ে পড়েন। কিন্তু গণিত কি আসলেই ভয়ের কিছু? নাকি এর পেছনে রয়েছে পাঠ্যক্রমের অযৌক্তিক জটিলতা, আর পাঠদানের গতানুগতিক পদ্ধতি?

গণিতের প্রতি ভয় সাধারণ কোনো বিষয় মনে হলেও গবেষণা বলছে, গণিতভীতি এক ধরনের মানসিক বাধা। গণিতভীতি বলতে এমন একটি মানসিক অবস্থাকে বোঝানো হয়, যাতে শিক্ষার্থী গণিতের কথা শুনলেই আতঙ্কিত হয়ে পড়ে, গণিতের সমস্যা সমাধান করতে ভয় পায় এবং গণিতের প্রতি নিজের সক্ষমতা নিয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করে। এটি সরাসরি মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতাকে প্রভাবিত করে। অনেকের মাঝে সমস্যা সমাধানের স্বাভাবিক বুদ্ধি তৈরিতে বাধা তৈরি করে। শুধু তাই নয়, গণিতভীতি একজন শিক্ষার্থীর আত্মবিশ্বাস কমিয়ে দেয়। ২০২৫ সালের অক্টোবরে 'অ্যাক্টা সাইকোলোজিকা' জার্নালে প্রকাশিত এক গবেষণায় দেখা যায়, বাংলাদেশের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থীদের মধ্যে গণিতভীতি তাদের সামগ্রিক ফলাফলকে উল্লেখযোগ্যভাবে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করে। এছাড়া গবেষণায় অংশ নেয়া শিক্ষার্থীদের মধ্যে যারা এসএসসি ও এইচএসসিতে দুর্বল ফল করেছিল, তাদের ৬৫.৭ শতাংশই ভুগছিল তীব্র গণিতভীতিতে। সেই সঙ্গে ছেলেদের তুলনায় মেয়েরা এই ভীতির শিকার হয় প্রায় ৫৩ শতাংশ বেশি।

২০২৪ সালে ৮৯টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ৪৮৬ জন কিশোর-কিশোরীর ওপর চালানো একটি সমীক্ষায় দেখা যায়, নেতিবাচক অতীত অভিজ্ঞতা ও শিক্ষকের অপর্যাপ্ত সমর্থন সরাসরি শিক্ষার্থীর নিজের কার্যক্ষমতাকে কমিয়ে দেয়। মূলত গণিতের ভিত্তিটাই থাকে দুর্বল। 'ব্রিং লার্নিং টু লাইফ' শীর্ষক এক ইউনিসেফ প্রতিবেদনে একটি তথ্য উঠে আসে– প্রাথমিক শিক্ষা শেষে ষষ্ঠ শ্রেণীতে উঠে ৯১ শতাংশ শিক্ষার্থী পঞ্চম শ্রেণীর অর্ধেক প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পারেনি। অর্থাৎ ভিত্তি মজবুত না থাকায় তারা কেবল মুখস্থ করে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিল।

আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধক হলো 'মুখস্থ নির্ভরতা'। গণিতভীতি শুধু পাঠ্যক্রমের সমস্যা নয়, শিক্ষকের ভূমিকাও যথেষ্ট। অধিকাংশ শিক্ষার্থীর মাঝে শিক্ষকের কাছে প্রশ্ন করা ও শেখার মানসিকতা তৈরি হতে পারছে না। এর জন্য শিক্ষকের পাঠদান প্রক্রিয়া ও তার আচরণ অনেকাংশে দায়ী। শ্রেণীর অধিকাংশ শিক্ষার্থী ক্লাসে শুধু সময় পার করে অন্যমনস্কতা ও অবহেলায়। এছাড়া তারা পরীক্ষায় ভুল করলেও সেই ভুল শুধরে দেওয়ার সংস্কৃতি শিক্ষকের মাঝে নেই বললেই চলে, আর শিক্ষার্থীরাও সেটা জানতে আগ্রহ বোধ করে না। মূল সংকট তৈরি হচ্ছে পাঠদান প্রক্রিয়ায়। শিক্ষক ছাত্রছাত্রীদের কাছে গণিতকে সহজভাবে উপস্থাপনের দক্ষতার অভাবে ভুগছেন; এর জন্য প্রয়োজন ছিল যথেষ্ট প্রশিক্ষণ প্রদান। ফলে শিক্ষার্থীরা গণিতকে জটিল ও একঘেয়ে মনে করে। অন্যদিকে নতুন শিক্ষাক্রম প্রণয়নকারীরা অভিযোগ করেন যে, বর্তমান শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নযোগ্য নয়। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, উচ্চ পর্যায়ের গণিত বাদ দিয়ে এবং বারবার সংস্কারের নামে অর্ধশিক্ষিত পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানোর ফলে শিক্ষার্থীরা মৌলিক বিষয়গুলো আয়ত্ত করতে পারছে না। পাঠ্যক্রমের পরিবর্তন করা জরুরি। গণিত শুধু সমাধানের পাশাপাশি বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করা ও গল্প, খেলার মাধ্যমে গণিতের প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি করতে হবে। এজন্য বাধ্যতামূলক শিক্ষক প্রশিক্ষণ, বইয়ের পরিমার্জন ও প্রয়োজনীয় সরঞ্জামের ব্যবস্থা করতে হবে। গণিতের ক্লাসে ভুল করা মানে আরও ভালো করে শেখা– এই ধারণা প্রচলন করতে হবে। এজন্য শিক্ষক ও অভিভাবককে শিক্ষার্থীর ভুল শুধরে দিতে উদ্যোগী হতে হবে। স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশগুলোর মতো 'ভুল বিশ্লেষণ ক্লাস' চালু করা যেতে পারে, যেখানে শিক্ষার্থী নির্দ্বিধায় বলতে পারে, 'আমি এটা কেন ভুল করলাম?' যে শিক্ষার্থী এক ক্লাসে থাকা অবস্থায় গণিতের প্রতি পারদর্শিতা অর্জনের আগে তাকে কোনোমতে পাস করিয়ে পরবর্তী ক্লাসে উত্তরণের সংস্কৃতি বন্ধ করতে হবে। সেই সঙ্গে বইয়ের মতো হুবহু অঙ্ক পরীক্ষার প্রশ্নে দেয়া কমিয়ে আনতে হবে, যাতে শিক্ষার্থীরা মুখস্থ করার পদ্ধতি থেকে বের হতে বাধ্য হয়।

[লেখক: শিক্ষার্থী, গণিত বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়]